19

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 1 7 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারীর অবস্থান

শাওয়াল খান

"তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।" বহুল ব্যবহারে খ্যাতিমান বীর নেপোলিয়নের এই উক্তি আজ বাসি প্রায়। তবু প্রাসঙ্গিকতার কারণে উক্তিটি বারংবার উদ্ধৃত হয়। শিক্ষা প্রসঙ্গে নারী পুরুষ সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য। তারপরও নেপোলিয়ন কেন এই উক্তি করেছিলেন? সমাজে, সংসারে, পরিবারে মায়ের ভূমিকার কোন তুলনা হয় না বলেই? না সমান অংশীদারিত্বের কারণে?

যেদিন থেকে পৃথিবীর বুকে মানুষের পদচারণা শুরু হয় সেদিন থেকেই শিক্ষার সূত্রপাত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে। নারী সমাজের একজন হয়েও কেন যেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী কিন্তু সাক্ষরতার হার এবং শিক্ষার হার কি সেই সমপর্যায়ে গিয়ে পৌছাতে পেরেছে? কোন কোন দেশ যুগের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমানায় এসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর বিশ্বে যখন বিদ্যের রাজত্ব চলছে, সময়ের ঠিক এমনি এক পর্যায়ে এসে বাংলাদেশ সাক্ষরতার জন্য লড়াই করছে। শুধুমাত্র সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে কি আধুনিক জীবনের চাহিদা পূরণ সম্ভব? আধুনিক জীবন নয় সাদামাটা সাধারণ জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনেও চাই শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষের জীবনের ইতিবাচক উপলব্ধি ও সামগ্রিকতা নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক আয়োজন সংযোজন চলছে বটে, তবে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারে দৈন্যতা ঘুচছে না, পঙ্গুত্ব বিলোপ হচ্ছে না, সত্যিকারের জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আক্ষেপ প্রণিধানযোগ্য "শিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না।" (লোক শিক্ষা ১৮৭৮/বাং ১২৮৫ অগ্রহায়ন) ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এভাবে "পূর্বকালে এদেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল, ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে।" 'নিম্নগামী পরিস্রবণ' ধারায় তৈরী প্রশাসকরা দেশপ্রেমিক ও স্বজাতি স্বভাবী নিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে হয়ে উঠে স্থানু, মেরুদন্ডহীন, চাটুকার ও দেশপ্রেম বিবর্জিত। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তার অভাব নেই। অথচ শাশ্বত শিক্ষার যে ধারা তা আর গড়ে উঠে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রয়েছে কিছু কিছু অবয়বে পরিবর্তন হলেও প্রকৃত বিদ্যাচর্চার, বিদ্যা অর্জনের যে ধারা তা গড়ে উঠছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে জ্ঞানদায়িনী মা সে ধারা বিরাজ করছে না। এখনও সেই পরাধীন আমলের কেরানীকুল তৈরীর ধারাই অব্যাহত। ফলে বড় বড় সার্টিফিকেটধারীরাও শুধু সার্টিফিকেট সর্বস্ব হয়ে শিক্ষিত হচ্ছে না। বিরাজমান এই ধারা বিরূপ প্রভাব ফেলছে সমাজ, সংসার সর্বত্রই। আমরা সার্টিফিকেটধারী মা পেলেও প্রকৃত শিক্ষিত মা পাচ্ছি না।

"যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মনকে আলোকিত করে না, মনের অন্ধকার গুহাগুলো জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত করে না, সে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। কারণ মানুষের অন্তরের ক্ষমতা অসীম ও সৃজনশীল।" আজ সেই অন্ধ গুহার তালা খুলে দিতে হবে যাতে আলোর ছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হয়। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে পূর্ণ মানুষ গড়ার শিক্ষার কথাই বলে গেছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যতা ঘোচাতে মহা মনীষীদের মতাদর্শ অনুসরণে বাধা কোথায়?

সংখ্যায় কম হলেও গ্রাম, শহর সর্বত্রই নারী এখন শিক্ষায়, রাজনীতিতে, সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী সংগঠনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিজেকে জড়িয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বাইরে উৎপাদনমুখী কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সীমিত একথা কারো অজানা নয়। এটার সবচেয়ে বড় বাধা নারী শিক্ষার নিম্নহার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্নভাবে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে উৎসাহদান করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফলস্বরূপ বর্তমানে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ৪৭% বলে দাবী করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে যেন ব্যবধান করা না হয় সে জন্য সরকার কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করে দুর্গম এলাকার অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। এতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সকলে মহিলা।

স্যাটেলাইট স্কুলের সংখ্যা ২,৫০০ থেকে ১২,০০০ বৃদ্ধিকরণ।

দূর গ্রামাঞ্চলে কম্যুনিটি স্কুল স্থাপন করে স্থানীয় সমাজকে নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান।

শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা।

ভিডিও ক্যাসেটসহ বিভিন্ন প্রচার লিপি ও গণমাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষিত করতে উৎসাহ প্রদান।

মহিলাদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া।

শিক্ষক পদে মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিসটেন্স ষ্টাইপেন্ড কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়তা দান।

শিক্ষা ক্যাডারে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তর ভিত্তিক যথা–প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা। ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৬ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে শুরু হয়। কিছু কিছু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত; নিম্ন মাধ্যমিক (গ্রেড ৬-৮); মাধ্যমিক (গ্রেড-৯-১০); এবং উচ্চ মাধ্যমিক (গ্রেড ১১-১২)।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে। যেমন–২ বছরের সাধারণ ডিগ্রী (বিএ, বিকম, বিএসসি)। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য তিন বছরের বিশেষ ডিগ্রী (অনার্স কোর্স বা সম্মান)। চিকিৎসা প্রকৌশল ও কৃষি শাস্ত্রে ৪-৫ বছরের পেশা ভিত্তিক ডিগ্রী। মাষ্টার্স ডিগ্রী (মেয়াদ ১-২ বছর, পূর্বের অর্জিত শিক্ষা সাপেক্ষে)। এমফিল ও পিএইচডি (এমফিল এর জন্য ২ বছর, পিএইচডির জন্য ৩ বছর)। এর বাইরে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তিন স্তর বিশিষ্ট সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স। এছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ক) ১ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স (পুরুষের জন্য গ্রেড-১২ এর পরে, মহিলাদের জন্য গ্রেড ১০-এর পরে); খ) একবছর মেয়াদী ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্স (ডিগ্রী কোর্সের পর) এবং গ) এক বছর মেয়াদী মাষ্টার ইন এডুকেশন কোর্স ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্সের পর।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল একটি সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। তা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) প্রচলিত এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল ১৬ বছরের (৫ বছরের এবতেদায়ী, ৫ বছর দাখিল, ২ বছর আলীম, ২ বছর ফাজিল এবং ২ বছর কামিল)। এতকিছুর পরও আমরা কি বলতে পারি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত? সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে আসল প্রতিবন্ধকতাটা কোথায়? স্কুল উপযোগী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী সবাইকে যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা, না অকালে ঝরে পড়া? এছাড়াও যারাই বা উল্লিখিত স্তর অতিক্রম করে এসেছে এদের কয়জনই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে এটা আজ সত্যিকার অর্থেই প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদটা কোথায়? পরিকল্পনা প্রণয়নে না শিক্ষানীতি প্রণয়নে? অথবা পরিকল্পিত বা প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে? প্রায়শঃ বলা হয়, আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সাজানো হয়েছে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। যথা–প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীর মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃংখলা, শিষ্টাচার বোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগরণে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা। মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি, মানবাধিকার ও পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ ও সৃজনশীল মানবসম্পদ সৃষ্টি। শিক্ষার্থীকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। প্রশ্ন হলো, উদ্ধৃত উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হয়েও শিক্ষার্থীরা কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে? সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে না পেরে শিক্ষার্থীরা হতাশ হচ্ছে। এ হতাশা দীর্ঘদিন জিয়িয়ে রাখলে সমাজের অবক্ষয় অনিবার্য।

জগৎ পরিবর্তনশীল। যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন অনিবার্য। বিশ্বজুড়ে আজ শিক্ষার প্রেক্ষাপট আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের যুগ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশের যুগ। তাই শুধু বাকসর্বস্ব শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট চাহিদা সম্ভব নয়। তার জন্য মানুষের ভিতর অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে দেয়া প্রয়োজন। এজন্য দরকার কার্যকর ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে শুধু বৈষম্য বিরাজ করেই ক্ষান্ত হয় না মারাত্মক বিরূপ প্রভাবও ফেলে, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ধারা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি শিক্ষা ধারা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বেড়ে উঠছে যা কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল। এইসব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বর্তমানে এদেশে ৫০০টি কিন্ডার গার্টেন আছে যার অধিকাংশই রাজধানী শহরসহ দেশের বিভিন্ন জেলা সদর ও পৌর এলাকায় অবস্থিত। এ ধরনের ব্যবস্থা অত্যধিক ব্যয়বহুল। ফলে শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরাই কিন্ডার গার্টেন এবং ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করছে। সার্বজনীন বা সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্দিষ্ট কোন পাঠক্রম না থাকায় কোনটি আমেরিকা, কোনটি যুক্তরাজ্য, কোনটি বা ভারতের পাঠক্রম অনুসরণ করছে। কিন্ডার গার্টেনে ইংরেজীর উপর অধিক গুরুত্ব আলোপ করা হয়। তার সাথে কোন কোন স্কুলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক কথায় শিক্ষার কোন সার্বজনীন রূপ নেই কেন? সরকার প্রণীত শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম-নীতি কি সার্বজনীন নয়? উচ্চ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা তা গ্রহণ করছে না কেন? নতুবা কিন্ডার গার্টেনের ধারাই যদি সার্বজনীন হয় তাহলে তা আমাদের জাতীয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না কেন? শিক্ষা ক্ষেত্রের শুরুতেই কেন এই শ্রেণী বিভেদ? কেন এই বৈষম্য? যে দেশে সবার জন্য শিক্ষার প্রতিশ্রুতি অবারিত, সেদেশে শিশুরা কেন চরম বৈষম্য আর শ্রেণী বিভেদ নিয়ে বেড়ে উঠবে? এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুরা ভবিষ্যতে কতটুকু সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে নতুন পাঠ্যসূচী যুক্ত পাঠ্যবই চালু করা হয়। এ নতুন পাঠ্যবইগুলো প্রণীত হয়েছে ৫২টি যোগ্যতা নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ৫২টি যোগ্যতা অর্জন করবে। অর্থাৎ তারা পাঠ্যবই ও সংবাদপত্র পাঠ, চিঠি লেখা এবং হিসাব-নিকাশ করতে পারবে। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) -এর এক সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ। নতুন পাঠ্যসূচী যুক্ত পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে ঐ যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না। তারা দেশের ৫টি জেলার ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমীক্ষা দেখেছেন মাত্র ২.৭% শিক্ষার্থী এ পাঠ্য বই খুব ভালো বুঝে, ১১.১% মোটামুটি ভাল বুঝে, ৩৯.২% কিছুটা বুঝে এবং ৩৯% কিছুই বুঝে না বয়স এবং পরিবেশ অনুযায়ী মেধা শক্তির সামঞ্জস্য না রেখে কঠিনতর পাঠ্য পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া তাদের অনাগ্রহের কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

কিন্ডার গার্টেন স্কুলের সিলেবাসও অত্যন্ত ব্যাপক। একজন শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার উপর লক্ষ্য না রেখেই এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় বিভিন্ন বিষয়। এতে শিশু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। একজন শিশুর অন্তর্নিহিত সৃজনশীল মেধার স্ফূরণ ঘটাতে হলে তাকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে-এটা সর্বজন স্বীকৃত। আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মান সম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ বিধায় সতর কিসিমের গড়ে উঠা কোচিং সেন্টারে আশ্রয় নিচ্ছে উচ্চতর শিক্ষাস্তরে পদার্পণের লক্ষ্যে। কোচিং সেন্টারে মাস তিনেকের শিক্ষাই যদি এত কার্যকরী হয় জাতীয় পর্যায়ের ১২ বছরের ধারাবাহিক শিক্ষা ধারা বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ১২ বছর সাধনা করার পরও যেকোন শিক্ষার্থীর ভুঁইফোড় কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউশনি কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া রীতিমতো লজ্জাকর। মোদ্দাকথা, নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষার অধোগতি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। অনিবার্য হতাশা।

মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মনকে আলোকিত করে না, মনের অন্ধকার গুহাগুলো জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত করে না, সে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। কারণ মানুষের অন্তরের ক্ষমতা অসীম ও সৃজনশীল।" আজ সেই অন্ধ গুহার তালা খুলে দিতে হবে যাতে আলোর ছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হয়। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে পূর্ণ মানুষ গড়ার শিক্ষার কথাই বলে গেছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যতা ঘোচাতে মহা মনীষীদের মতাদর্শ অনুসরণে বাধা কোথায়?

শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষ্যের নির্ধারণ কল্পে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কম সময়ে কম খরচে ভাল ফলাফল পাওয়ার আশায় একদিকে শিক্ষাক্রম অবিরতভাবে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার সাধন করা হচ্ছে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্তরেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে যাবতীয় কুকর্ম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নকল প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। পুস্তক নির্ভর তথ্য বিবরণী সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্ত করে পরীক্ষা দেয়া আর নকল করে দেখে দেখে লেখা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রায় একই। বিদ্যা অর্জনের যে অন্যরকম একটা আকর্ষণ, অন্যরকম আনন্দ হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন সেটা আমাদের শিক্ষায় নেই কেন? শিক্ষার সাথে ডামাঢোল পিটিয়ে কি শিক্ষা বিস্তার সম্ভব? দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ সার্টিফিকেট সর্বস্ব। জীবন সংগ্রামে অসম, অক্ষম প্রতিযোগির বদনাম নিয়ে শিক্ষিত মানুষের পঞ্চাশ শতাংশই শিক্ষিত বেকারে পরিণত হচ্ছে।

শিক্ষার অর্থনৈতিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা হচ্ছে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র যা থেকে বেশি রিটার্ণ আসে। এটি দেখিয়েছেন অর্থনীতিবিদ আর্থার শুল্জ। তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োজিত সম্পদের রেট অব রিটার্ণ ৩৫%, মাধ্যমিক শিক্ষায় ২০% এবং উচ্চ শিক্ষায় ১১%। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, ডেবিড রিকার্ডো, মার্শাল প্রমুখের মতে শিক্ষা হলো এমন একটি ক্ষেত্র যার কাজ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চালন ঘটানো। বিশ শতক জুড়ে অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। বরার্ট সলো, আর্থার শুল্জ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটে তা শুধু ব্যক্তি মানুষের বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষার অধিকার আজ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাতে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সদ্য প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে আগামী এক যুগে (১৯৯৮-২০১০) দেশের শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় হবে ৯৭ হাজার ৫শ' ২৪ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থসহ প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে এ অর্থ ব্যয় হবে। কেবল নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে বারো বছরে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ১৭ হাজার ৯শ' ৬০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে। বাকি ১২ হাজার ৪০ কোটি টাকা আন্তর্জাতিক সহায়তা অথবা দেশীয় উৎস থেকে বরাদ্দ বাড়িয়ে সংগ্রহ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টে এ কথা বলা হয়।

বিগত দিনেও আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় একেবারে কম করা হয়নি। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রতিদান পাচ্ছি কি? আমাদের প্রত্যাশিত শিক্ষা খাতের এই বিশাল বিনিয়োগ যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট কর্মক্ষম জনশক্তির ৪০% বেকার। গেল ক'টা বছরেও এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ঘটেনি। এটা দেশের জন্য একটা ভয়াবহ দুঃসংবাদ। একটি দেশের মোট কর্মক্ষম লোকের ৪০% যদি কাজ না পায় বা না করে, ৪০% শিক্ষিত জনশক্তি যদি মানব পুঁজি হয়েও অকেজো হয়ে থাকে তা হলে সেই দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদদের দেয়া তত্ত্বও (শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্ক বিষয়ে) আমাদের কাছে নিছক গল্পই থেকে যেতে বাধ্য। যে শিক্ষা আত্মার বিকাশ ঘটায় না, সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার উৎস মূলে বাধার সৃষ্টি করে না, ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি রোধ করে না, উৎকোচ প্রবণতায় ঘৃণাবোধ জাগায় না সেই শিক্ষায়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় কি ই বা আছে? শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশই যদি না ঘটে, মননশীলতার বিকাশই যদি না ঘটে সেই শিক্ষার মহত্ব কোথায়?

জগৎ পরিবর্তনশীল। যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন অনিবার্য। বিশ্বজুড়ে আজ শিক্ষার প্রেক্ষাপট আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের যুগ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশের যুগ। তাই শুধু বাকসর্বস্ব শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট চাহিদা সম্ভব নয়। তার জন্য মানুষের ভিতর অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে দেয়া প্রয়োজন। এজন্য দরকার কার্যকর ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজে শুধু বৈষম্য বিরাজ করেই ক্ষান্ত হয় না মারাত্মক বিরূপ প্রভাবও ফেলে, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। আমাদের অতীত বিচারে দেখতে পাই দু'শ বছরে ঔপনিবেশিক বৃটিশ আমলে শুধু কেরানী তৈরীর কারখানা হিসেবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ধরনের শাসনে বাঙ্গালীর শিক্ষা-সঙ্কোচনের নীতি অনুসরণ করা হয়। এখনও স্বাধীন বাংলাদেশে সার্বজনীন কোন শিক্ষা ধারা গড়ে উঠেনি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি। কিন্তু কালের আবর্তে আমরা এগিয়ে চলছি এই এগিয়ে চলাকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্যে অতীতের সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি, ক্ষোভ ও হতাশা সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা জাতির অপরিহার্য দায়িত্ব।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে নারী সমাজ আরও পিছিয়ে। বিশেষ করে শিক্ষায় নারী সমাজ বেশ অনগ্রসর। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, চাকরি এবং অন্যান্য সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, নারী শিক্ষার হার শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীতকরণ, নারীর স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ, নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর নিজ সত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে মেয়েদের স্কুল ত্যাগ রোধকল্পে বিশেষ উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ। প্রতি থানায় একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, একটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকলে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুবিধা প্রদান, ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সঠিক হারে (৬০%) মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন পাস করা হয়। ফলে শিশু ভর্তির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাত ৫৩:৪৭-এ গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরে এ ব্যবধান অনেক বেশী। শিক্ষার বদৌলতে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুপাতে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক পিছিয়ে।

(সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে দেশের মোট ১১,৯৩৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯৭২টি বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলোর মোট শিক্ষার্থী ৪৭,৫৬,৯০৮ জন এবং ২২,০৮,২৯৯ জন মাত্র ছাত্রী। বিদ্যালয়গুলোতে চাকরিরত মোট ১,৩৮,৭৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০,১৮৭ জন মাত্র শিক্ষিকা। দেশের মোট ১১৬৭টি কলেজের মধ্যে ১৫৯টি কলেজই ছাত্রীদের। কলেজসমূহের মোট ৩২,৮৯৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫,৮৮০ জন মহিলা শিক্ষক। কলেজ পর্যায়ে মোট ১১,৫২,১১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩,৭৭,৮২৫ জন ছাত্রী। সরকার ঘোষিত ২০০৬ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশব্যাপী বাস্তবায়নে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। শিক্ষার হারে ব্যবধান থাকলেও সাক্ষরতা অর্জনের হার নারী পুরুষে তখন আর কোন ব্যবধান থাকবে না।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই কম। ফলে সরকার রাষ্ট্রপতির ১০ শতাংশ কোটা ব্যবহার করে উচ্চ পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চুক্তি ভিত্তিক এসব নিয়োগ দেয়া হবে। নারী উন্নয়নে বা নারীর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনে এটা শেষ কথা নয়।

সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক, কর্মমুখী ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাড়ানো দরকার নারী শিক্ষার হার। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যৌথ উদ্যোগের শক্তিই শিক্ষাকে করে তুলতে পারে কার্যকর কর্মমুখী। বাড়াতে পারে নারী শিক্ষার হার। একমাত্র আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীর শিক্ষা, যথাযথ অবস্থান ও অন্যান্য অধিকার আদায় সম্ভব। নারী-পুরুষ কেউ যেন নিজ নিজ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয়। সেটাই হবে শিক্ষার আদর্শ। সমাজের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে নারী সুতরাং নারী পিছালে সমাজ এগুবে কিভাবে?

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ত অনেক প্রশ্নের অবতারণা করে চলেছে। যেসব প্রশ্ন উত্থাপন না করলেই নয় এমনতর জীবন ঘনিষ্ঠ কয়েকটি প্রশ্নের সূত্রপাত করলাম মাত্র। আশা রাখি সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানীতি প্রণেতা, ছাত্র সমাজ, অভিভাবক মহল ও শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন আরো প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, সমস্যা চিহ্নিত করবেন, মতামত প্রকাশ করবেন, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ নিবেন। সময়ের দাবী অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে পিছপা হবেন না। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। সর্বোপরি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আত্মসমালোচনা আত্ম-সংশোধনের একটা বড়ো হাতিয়ার। □